আকালের ছবি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে দর্শনচর্চা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকরা অনুরোধ করলেন লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে দর্শনচর্চা বিষয়ে কিছু লিখুন। প্রথমে গররাজি হব বলেই ঠিক করেছিলুম। কিন্তু তার পরেই মনে হলো আর কিছু না হোক এই সুযোগে বাঙালা ভাষায় দর্শনচর্চার এলাকাটা জরিপ করে ফেলা যাবে। ব্যবসায়িক ক াগজপত্রে দর্শন নিয়ে লেখাপত্র যে খুব বেশি ছাপা হবে না -- এ তো জানা কথা। যদি কিছু বেরয় তো বেরবে বিশেষজ্ঞদের পত্রিকায় অ ার লিট্‌ল ম্যাগাজিনে।

কিন্তু এখানেও একটু খটকা লাগে। লিট্‌ল ম্যাগাজিন তো দর্শনচর্চার জায়গা নয়, সাহিত্যচর্চাই তার প্রধান বা একমাত্র লক্ষ্য। তাই দর্শন নিয়ে খুব বেশি লেখা আশা করে লাভ কী?

আরও একটা কথা আছে। সাধারণভাবে বাঙালি পাঠক, আর বিশেষ করে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের পাঠক দর্শনে তেমন উৎসাহী নন। দেখে-শুনে মনে হয় সাহিত্য বলতে তাঁরা বোঝেন স্রেফ কবিতা ও গল্প - উপন্যাস, আর বড় জোর সেগুলো নিয়ে ছোটো - বড় নিবন্ধ। অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে লেখা যেন সাহিত্য-র এলাকায় পড়ে না। সৃষ্টিশীল রচনার বাইরে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা শুধু সেই বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে।

সাহিত্য সম্পর্কে এত সঙ্কীর্ণ ধারণা সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। তবু ঘটনাচক্রে এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষামূলক গল্প- উপন্যাস ছ াপতে যদি বা কোনো প্রকাশক রাজি হন, দর্শনের নাম শুনলে তাঁরা হাত গুটিয়ে ফেলেন। এই পরিবেশে যেসব পাঠক বড়হয়েছেন, দর্শন সম্বন্ধে তাদের কোনো আগ্রহ না - হওয়ারই কথা। তবু এই পরিবেশের চাপ কাটিয়ে আঙুলে - গোনা কিছু পাঠক দর্শন নিয়েও পড়তে ও জানতে চান --- আপাতত এই যথেষ্ট।

ভূমিকা অনেক লম্বা হলো। এবার আসল কথায় আসা যাক। কল্লোল (১৯২৩) থেকে বাঙলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের শু --- এমন ধরে নিলে ১৯৪৭ -এর আগে অবধি এক পরিচয় (১৯৩১) ছাড়া খুব বেশি লিট্‌ল ম্যাগাজিন পাওয়া যাবে না। ১৯৫০ -এর দশকের গোড় াতেও লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন নামটি খুব চালু ছিল না। বলা হতো স্রেফ 'পত্রিকা'। ১৯৬০ -এর দশক থেকেই তার পাশাপাশি লিট্‌ল্‌ম্যাগা জিন নামটি শোনা গেল। সবুজ পত্র (১৯১৪) কল্লোল - এর আগে, পরিচয় - এর পরে বেরিয়েছিল পূর্বাশা (১৯৩২), কিন্তু সেটিকে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন বলা ঠিক হবে না। তবে তিনটি পত্রিকাতেই দর্শন নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ বেরয়। পরিচয়-এ প্রথম সংখ্যা থেকেই হীরেন্দ্রন াথ দত্ত লিখতে শু করেন বেদান্ত দর্শন নিয়ে; বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে ঐ পত্রিকাতেই লিখতেন বটকৃষ্ণ ঘোষ। বটকৃষ্ণের প্রবন্ধ পড়ে তারিফ করতেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। পূর্বশা-য় চার্বাকদর্শন নিয়ে লেখেন সরোজ আচার্য ও ক্ষিতিমোহন সেন। মার্কসবাদে পক্ষে-বিপক্ষে লেখা বেরয় পরিচয় ও শনিবারের চিঠি - তে। বটকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে সরোজ আচার্যর তর্কযুদ্ধ বাঙলায় দর্শনচর্চার জগতে মনে রাখার মতো ঘটনা।

একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে চার্বাকদর্শনই উনিশ ও বিশ শতকের মুক্তমনা বিদ্বানদের নজর কেড়েছিল বেশি। টোল চতুষ্পাঠীতে পড়া পণ্ডিত ও আধুনিক স্কুল - কলেজে পড়া বিদ্বান্ -- দু পক্ষই চার্বাকদর্শন নিয়ে বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন কলক াতা ও তার বাইরের ছোটোখাটো অগণ্য পত্রিকায়। সেগুলো বহুদিন হলো উঠে গেছে, কিন্তু খুব অল্প তথ্যর ওপর দাঁড়িয়ে চার্বাক/ লে াকায়ত-র পক্ষে বিপক্ষে কম প্রবন্ধ লেখা হয় নি। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন চার্বাকচর্চা এসেছিল মূলত মার্কসবাদীদের আগ্রহ থেকে। প্রাচীন ভ ারতেও যে আপসহীন একটি বস্তুবাদী দর্শন ছিল সেটিই তাঁরা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ এখানে দার্শনিক বিশ্বাসের মিলই ম ার্কসবাদীদের চার্বাকচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এই ধারার শ্রেষ্ঠ লেখক অবশ্যই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লোকায়ত দর্শন (১৯৫৭) বেরনোর আগেই পরিচয় -এ তার কয়েকটি অধ্যায় ছাপা হয়। পরে দেবীপ্রসাদ বাঙলায় লেখা ক্রমশই কমিয়ে দেন। তবে অনেক দিন পর্যন্ত পরিচয়, চতুষ্কোণ ও আরও কিছুপত্রিকায় ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁর কিছু প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।

মার্কসবাদের দিকে কোনো ঝোঁক না - থাকলেও নিজস্ব তাগিদ থেকে বহু বছর ধরে চার্বাকচর্চা চালিয়ে যান সংস্কৃত পণ্ডিত, দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন যাকে বলে, অ্যাংলো - স্যান্‌স্কিটিস্ট টোল ও কলেজ দু- জায়গাতেই সংস্কৃত শিখেছিলেন।। ১৯২৮ থেকে একাদিক্রমে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে চার্বাক বিষয়েও তিনি লিখে গেছেন। পরে সেগুলি চার্বাক দর্শন বইতে সঙ্কলিত হয়েছে (১৯৫৯,১৯৮২)। পরে যাঁরা চার্ব াকচর্চা করেছেন তাঁরা সকলেই দক্ষিণারঞ্জন ও দেবীপ্রসাদের কাছে ঋণী।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে ভবানী (শঙ্কর) সেন (গুপ্ত)- এর দর্শনে আগ্রহ ছিল। উত্তরকাল, নতুন গ্রাম ও শহর, পরিচয়, বিংশ শতাব্দী, সপ্তাহ, স্বাধীনতা (শারদীয়া) ও অন্যান্য পত্রিকায় সে - আগ্রহর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা, অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য শ্রমিকের দর্শন নামে একটি বই লিখেছিলেন (১৯৯৫)। তার কয়েকটি অধ্যায় ধারাবাহিক ভাবে বেরয় উৎস মানুষ - এ (১৯৯২-৯৩৬)।

ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে যতই গবেষণা হয়ে থাকুক, বাঙলা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে তার কোনো ছাপ পড়ে নি। সাহিত্যপত্র-এর এক সময়ে সায়ণ- মাধব - এর সর্বদর্শন - সংগ্রহ বইটির বেশ কয়েকটি অধ্যায়ের ধারাবাহিক অনুবাদ বেরিয়েছিল (পরে পুরো বইটি আলাদা ভাবে বেরয়)। নবপর্যায় সাহিত্যপত্র -এ কার্ল পপার সম্বন্ধে লেখেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (যাদবপুর ঝিবিদ্যালয়)। জে. বি. এস. হলডেন -এর দর্শন ভাবনার কিছু নমুনার অনুবাদ বেরয় পরিচয় ও সাহিত্যপত্র-এ। প্রবন্ধ পত্রিকা-য় অস্তিবাদ নিয়ে নিয়মিত লিখতেন মৃণালকান্তি ভদ্র। পরিচয়, অগ্রণী, ইত্যাদি পত্রিকায় মুলত ইওরোপীয় দর্শন নিয়ে লিখতেন সতীন্দ্রনাথ চত্রবর্তী। এসইহলো ১৯৬০ - এর দশকের কথা।

১৯৭০ -এর দশক থেকে নানা দার্শনিক সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত আলোচনা নানা পত্রিকায় পাওয়া যাবে। তবে এক হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বাদে একই সঙ্গে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে সমান দক্ষতার সঙ্গে আর কেউ বোধহয় লেখেন নি। তাঁর প্রবন্ধগুলি বেরিয়েছিল খড়দহ থানা সমাচার (থানা মানে এখানে পুলিশ স্টেশন নয়, সাব - ডিভিশন) আর পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ - এর মুখপত্র আন্তর্জাতিক-এ, পরে আনৃণ ও অনুষ্টুপ - এ। ১৮৮০ -র দশকের দর্শন নিয়ে নানা পত্রিকায় লিখেছিলেন সতীনাথ চত্রবর্তী।

মানবমন পত্রিকায় ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখতেন পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে। তার সঙ্গে অনিবার্য ভাবেই কিছু দার্শনিক প্রশ্নও আসত। এই পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার। মার্কসবাদের সপক্ষে ও তার বিরোধীদের বিপক্ষে তাঁর বহু রচনা এই পত্রিকায় বেরিয়েছে। চুয়াল্লিশ বছর ধরে এই পত্রিকায় মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-এর সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে বহু প্রবন্ধ ও প্রবন্ধর অনুবাদ ছাপা হয়। বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, আশীষ লাহিড়ী ও তুষার চত্রবর্তী এখনও সে - কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এতক্ষণ যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের প্রায় কেউই 'পেশাদার' দার্শনিক নন, এমনকি কলেজ - ঝিবিদ্যালয়ে দর্শন নিয়ে পড়েন নি (দর্শনের ছাত্রছাত্রীরা লিখেছেন তাঁদের নিজেদের কাগজ দর্শন, দর্শন ও সমাজ ইত্যাদিতে)। কিন্তু অ্যাকাডেমিক বৃত্তর বাইরেও কিছু দর্শন - জিজ্ঞাসু নিজেদের মতো করে চর্চা চালিয়ে গেছেন। আর সে - চর্চার ফসল দেখা গেছে অজস্র লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে।

১৯৮০-র দশক থেকে কলকাতার বাজারে আধুনিকোত্তর ভাবধারা নিয়ে প্রচুর ইংরিজি বইপত্র এল। কিছু পাঠক ও লেখকের ঝোঁক গেল সেই দিকে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত যুত্তরাষ্ট্র সমেত পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে সমাজবাদী ব্যবস্থার পতন হয়েছে। মার্কসবাদের বিকল্প হিসেবে, বা আরও সাবধানী লোকের ভাষায়, পরিপুরক হিসেবে কেউ কেউ আঁকড়ে ধরলেন ডাক দেরিদা, মিশেল ফুকো প্রমুখ আধুনিকোত্তর দার্শনিকদের (যদিও এঁরা আদৌ দার্শনিক কিনা সে - নিয়েই প্রশ্ন থাকতে পারে)। যাই হোক, অনেক ক'টি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে এই সব ফরাসি লেখকদের সম্পর্কে লেখা বেরতে শু করল। ১৯৯০ -এর দশকে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনগুলোয় প্রধানত এঁদের বিষয়ে আর সেই সূত্রে সাধারণভাবে ইওরোপীয় দর্শন নিয়ে একের পর এক লেখা বেরিয়েছে অমৃতলোক, আলোচনা চত্র, এক্ষণ, এবং এই সময় এবং মুশায়েরা, গাঙ্গোপত্র, বারোমাস, রত্তকরবী, শব্দ শাব্দিক ইত্যাদি পত্রিকায়। বাংলাদেশ -এর কিছু পত্রিকাতেও (যেমন, কথাপট, প্রান্ত) একই ধরনের লেখা পাওয়া যায়।

আমার জানার বাইরে গুচ্ছ লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আছে। সেগুলিতে হয়তো খুবই দামি লেখাপত্র বেরিয়েছে। কিন্তু আমার সীমিত ক্ষমতায় ও সংগ্রহে যেটুকু দেখার ও পড়ার সুযোগ হয়েছে কেবল সেইটুকু এখানে হাজির করা হলো।

লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে দর্শনচর্চা সম্পর্কে আমার মতামত আপাতত এইরকম

১ সাধারণভাবে দর্শনচর্চা হয়েছে কম; খুবই কম।

২ যেসব প্রবন্ধ বেরিয়েছে তাতে প্রাচ্য দর্শনের চেয়ে পাশ্চাত্য দর্শনেরই পাল্লা ভারী।

৩ প্রায় সকলেই হাতফেরতা সূত্র থেকে লেখার মালমশলা জোগাড় করেছেন, অর্থাৎ খুব বেশি খাটেন নি।

৪ অনেক বিষয়ই লেখকদের নিজেদের কাছে স্পষ্ট নয়, তাই লেখাতেও জড়তা এড়ানো সম্ভব হয় না।

৫ প্রমাণপঞ্জি হাজির করার দায় বেশির ভাগ লেখকই এড়িয়ে যান, ফলে তাঁদের কথাকেই বেদবাক্য বলে ধরে নিতে হয়। পাঠকরা তাই একই সঙ্গে বঞ্চিত ও প্রবঞ্চিত হন।

চার্বাকদর্শন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি বহুদিন ধরে লিখছি। এই সিদ্ধান্তগুলো তাই আমার পক্ষেও অস্বস্তিকর। কিন্তু গত পঁয়তাল্লিশ বছর লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের পাঠক ও লেখক হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করাও তো সম্ভব নয়।

কেন এমন হলো?

বাঙালির দর্শনচর্চার ইতিহাস অনেক পুরনো। অন্তত দশক শতক থেকে প্রথমে মীমাংসা, পরে নব্যন্যায় বেদান্ত নিয়ে বিস্তর পণ্ডিত সমাজের বাইরে দর্শন নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ গড়ে ওঠে নি। তবে অন্যান্য শাস্ত্রর মতো দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কেও বেশ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব ছিল। নবদ্বীপ অঞ্চল ছিল দর্শনচর্চার কেন্দ্র। এখানে পড়তে আসতেন ভারতের নানা অঞ্চলের ছাত্র।

নতুন শিক্ষাপদ্ধতি চালু হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির আমলে। ইংরিজি হয়ে দাঁড়াল উচ্চশিক্ষার বাহন। অর্থাৎ মাতৃভাষার সঙ্গে নতুন শেখা পশ্চিমী দর্শনশাস্ত্রর সাক্ষাৎ যোগ গড়ে উঠল না।

তাতেও খুব একটা ক্ষতি হতো না। সব ইংরিজি - জানা দর্শনবিদ্‌ই বাঙলা ভাষাকে অবজ্ঞা করেন নি। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরাও বাঙলায় লিখতে শু করলেন (যদিও তাঁদের অনেকের বাঙলাই অনুস্বর - বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত)। কিন্তু লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনের জগতে তাঁরা অধরাই থেকে গেলেন। ফলে সাধারণ দর্শন - জিজ্ঞাসুর কাছে দর্শনকে পৌঁছে দেওয়ার কোনো উপায় তৈরি হলো না।

এর জন্যে স্রেফ লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের দুষে লাভ নেই। পাঠকদের তরফ থেকে তাঁদের দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি,সমাজবিদ্যা ইত্যাদি কোনো বিষয়েই নিয়মিত লেখাপত্র প্রকাশের তাগাদা ছিল না। ঋত্বিক ঘটক একবার লিখেছিলেন সিরিঅস চলচ্চিত্রকারের সামনে সারি সারি পাঁচিল খাড়া হয়ে আছে। দর্শদের উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন, "আপনারও একটি বড় পাঁচিল। বোধহয় সবচেয়ে বড় পাঁচিল।" একই কথা লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনের পাঠকদের সম্পর্কেও খাটে। তাঁরা যদি কবিতা, গল্প আর সাহিত্য - সমালোচনার বাইরে কিছু না - চান, সম্পাদকরাই বা অন্য কিছুর জন্যে ছুটে মরবেন কেন? লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনের এমন একটা প্রোফর্মা তৈরি হয়ে গেছে -- যেখানে দর্শনের প্রবেশ নিষেধ।

পাঠকদের তরফেও নিশ্চয়ই কিছু বলার আগে। কী ইংরেজ আমলে, কী তার পরে, শিক্ষা ব্যাপারটা আমাদের দেশে ঘোর পরীক্ষামুখা -- পরীক্ষাসর্বস্ব বললেও ভুল হয় না। পরীক্ষায় যা লাগবে না, ছাত্রছাত্রীদের তাতে উৎসাহ নেই। যদি কার ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহ দেখা দেয়, তা নিজ গুণে বা কোনো অ-সাধারণ শিক্ষক / শিক্ষিকা-র প্রভাবে। যিনি অন্য বিষয় নিয়ে পড়ছেন, তাঁর ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি দর্শনের পোশাকি ছাত্রছাত্রীরও সমস্ত জ্ঞান আসে পাঠ্যবই- এর বাছাই - করা কয়েকটি অংশ থেকে। বাঙালি পাঠক - পাঠিকার আগ্রহর এলাকা এত ছোটো যে নতুন কোনো বিষয়ের সেখানে জায়গা হয় না।

সবশেষে আসে লেখকের কথা। গত দশ - পনেরো বছরে আধুনিকোত্তর তত্ত্বাবলির ব্যাপারে পাঠকমহলের একটি অংশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলে ফুকো, বার্ত, দেরিদা, লাকঁ ইত্যাদি সম্পর্কে ছোটো - বড় নানা পত্রিকায় কয়েকটি আলোচনা বেরল। এই তত্ত্বকাররা সকলেই লিখতেন ফরাসিতে। এঁদের নিয়ে যাঁরা বাঙলায় লিখলেন তাঁদের প্রায় কেউই ফরাসি জানেন না। ফরাসিতেই পড়ুন আর ইংরিজি তর্জমাতেই পড়ুন, এই তত্ত্বকারদের লেখার ধরন বেশ দুর্বোধ্য। এবার তাঁদের নিয়ে যাঁরা বাঙলায় লিখলেন, তাঁদের কলমের গুণে সেগুলো হয়ে দাঁড়াল একেবারে অবোধ্য। দু - একজন ব্যাখ্যাকার তো বিশুদ্ধ ফাজলামোর আশ্রয় নিলেন। নতুন কোনো দার্শনিকের পরিচয় দেওয়ার নাম করে আত্মজীবনীর ছেঁড়া পাতা, অ্যাকাডেমিক জগতের কেচ্ছা ইত্যাদি ঢুকিয়ে পুরো বিষয়টিকেই তাঁরা খেলো করে তুললেন। দুষ্পাচ্য হলেও আপত্তির কারণ হতো না -- কিন্তু এইসব বাঙালির ভাষ্যকারের লেখা মুখেই তোলা যায়না; পেটে গেলে তো পাচ্য - অপাচ্যর কথা উঠবে। শুধু দুরূহ হলে তার একটা গতি করা যায়; বারবার পড়লে বা কোনো সহায়ক বই ঘাঁটলে কঠিন ব্যাপারও আর তত কঠিন ঠেকে না। কিন্তু ইচ্ছে করেই যেটা না - বোঝার জন্যে লেখা হয়েছে, সেটা বোঝাতে যদি সমানঅপাঠ্য কোনো কায়দা বেছে নেওয়া হয়, পাঠক - পাঠিকা তাহলে কী করবেন? ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা ছাড়া?

হেগেল সম্পর্কে বলা হয় দর্শনকে তিনি জার্মান বলতে শিখিয়েছিলেন। শুধু হেগেল নন, তাঁর সমকালের অন্যান্য জার্মান দার্শনিকদের ক্ষেত্রেও কথাটি সমান সত্যি। কিন্তু দর্শনকে বাঙলা বলাতে শেখাবেন এমন লেখকের আবির্ভাব পশ্চিমবঙ্গে বা বাঙলাদেশে-এ আজও হয় নি। একজন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিয়ে বসন্তের সূচনা হয় না। যে- দার্শনিকটি মননে স্বরাজ -এর কথা বলতেন, আজীবন তিনি লিখেছেন ইংরিজিতে। ফলে লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনের জগতে দর্শনচর্চার ছবিটা যে এত কণ হবে -- সে আর বিচিত্র কী?

সব মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্ত কিছুতেই এড়ানো যায় না